বাড়ি, বুড়ো, বুট

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাড়িখানি ভারী ভালো লাগল। চারিধারে বাগান—যদিও ফুলগাছের চেয়ে বড় বড় গাছই বেশি। টেনিস-খেলার জমি, মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের বেদি, একটি ছোট বাহারি ফোয়ারা, এখানে-ওখানে লাল কাঁকর-বিছানো পথ।

দোতলা বাড়ি—একেবারে হাল-ফ্যাশানের না হলেও সেকেলে নয়। বাড়ির জানলায় বা দেয়ালে প্রাচীনতার কোনো চিহ্নই নেই। কোথাও ফাট ধরেনি, কোথাও অশথ্-বট এসে জোর করে জুড়ে বসেনি।

কিন্তু তবু মনে হল, বাড়িখানি যেন রহস্যময়। ভাবলুম, বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠে মস্ত মস্ত গাছগুলো নিজেদের জন্যে একটি ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছে বলেই হয়তো এখানে এমন রহস্যের আবহ গড়ে উঠেছে। আমার পক্ষে এও এক আকর্ষণ। আমি রহস্য ভালোবাসি। রহস্যের মধ্যে থাকে 'রোমান্সে'র গন্ধ।

সাঁওতাল পরগনার একটি জায়গা। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের বায়ু-পরিবর্তনের দরকার। ডাক্তারের মতে এ-জায়গাটি নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে এখানে এসেছি, মনের মতন একটি বাড়ি খুঁজে নিতে। আজকের ট্রেনেই কলকাতা ফিরব।

খানিক ডাকাডাকির পর বাগানের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল—তার চেহারা না মালী, না দ্বারবান, না ভদ্র বা ইতর লোকের মতো। তার বয়স আশিও হতে পারে, একশোও হতে পারে! তার মাথায় ধবধবে সাদা, এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল। তার কোমর এমন ভাঙা যে হাড়-জিরজিরে দেহের উপর-অংশ একেবারে দুমড়ে পড়েছে। কিন্তু হাতের লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে সে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যে, তার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হলুম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কি চান?"

"বাড়ির ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—'টু লেট'। আমরা এই বাড়িখানা ভাড়া নিতে চাই।"

লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। সে এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ছিল বলে তার চোখ দেখতে পাইনি। এখনো দেখতে পেলুম না, কারণ তার চোখ দুটো এমনি অস্বাভাবিকভাবে কোটরগত যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের আবিষ্কার করাই যায় না! মনে হয়, লোকটা বুঝি অন্ধ। কিন্তু তারপর লক্ষ করে দেখলুম, দুই কোটরের ভিতর দিকে কি যেন চকচক করছে—দুই অন্ধকার গর্তের মধ্যে যেন দুই দীপশিখার ইঙ্গিত।

লোকটা আবার মুখ নামিয়ে ফেলে থেমে থেমে বললে, "ভাড়া নিতে চান? এই বাড়ি ভাড়া নিতে চান? বেশ!"

"বাড়িখানা আমাদের পছন্দ হয়েছে! এ বাড়ির মালিক কে?"

"বাড়ির এখনকার মালিক থাকেন বিলাতে। আগেকার মালিক কোথায় থাকেন, কেউ জানে না।"

"তাহলে ভাড়া দেব কাকে?"

"আমাকে।"

"কত ভাড়া?"

"সেটা ঠিক করবেন আপনারাই।"

রহস্যময় বাড়ি, রহস্যময় বৃদ্ধ এবং তার কথাগুলোও কম রহস্যময় নয়! মনে হল, রহস্যের মাত্রা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা ভালো নয়।

কি বলব ভাবছি, হঠাৎ গায়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। চমকে মুখ তুলে দেখি, ইতিমধ্যে আমাদের অজান্তেই আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার!

বুড়ো বললে, "বৃষ্টি আসছে। আপনারা একটু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াবেন চলুন।"

বুড়োর পিছনে পিছনে বাড়ির নীচের তালার বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

প্রকাশ আমার দিকে ফিরে বললে, "বৃষ্টিতে এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল, আগে বাড়ির উপরকার ঘরগুলো একবার দেখে আসি।"

বুড়োর দিকে ফিরে দেখি, সে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে ডাকলুম, সে যেন শুনতেই পেলে না। খানিক পরে হঠাৎ বললে, "ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?"

হাত-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললুম, "এখন সাড়ে পাঁচটা।"

বুড়ো যেন শীতার্ত কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আকাশে মেঘ আরো জমে উঠছে। অন্ধকারে সন্ধ্যা নামবে তাড়াতাড়ি। এ বৃষ্টি সন্ধ্যার পরেও পড়বে।"

"না পড়তেও পারে।"

"না, না, এ বৃষ্টি এখন থামবে না, হয়তো আজ সারা রাত ধরেই পড়বে। আমি মেঘ দেখেই বুঝতে পারি।"

প্রকাশ বললে, "কি সর্বনাশ, তাহলে আমরা স্টেশনে যাব কি করে? আজই তো আমাদের কলকাতায় ফেরবার কথা!"

বুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না—আজ আর থামবে না! পাহাড়ে-নদী ফুলে উঠবে, মাঠ ভেসে যাবে, পথ ডুবে যাবে। পালাতে চান তো এখনি পালান! সন্ধ্যার পর রাত আসবে, ঝড় উঠবে, বন কাঁদবে—এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না! এখনো সময় আছে, এখনো পালিয়ে যান!"

বুড়োর কথাবার্তার ধরন দেখে রাগ হল। বিরক্ত কণ্ঠে বললুম, "ঠাট্টা রাখো, শোনো! এ বাড়ি আজ থেকেই আমি ভাড়া নিচ্ছি। বৃষ্টি না থামে, আজ আমরা এইখানেই রাত কাটাব। কত টাকা দিতে হবে বল?"

বুড়ো আবার মুখ তুললে—আবার দেখলুম তার চক্ষুকোটরগত দুই দীপশিখার ঝিলিক! দন্তহীন মুখ ব্যাদান করে নীরব হাসি হেসে সে বললে, "আজ রাতে এখানে থাকবেন! থাকতে পারবেন?"

"কেন পারব না?"

"বাড়ির আগেকার মালিক আজ রাতে এখানে আসবেন। তিনি কোথায় থাকেন কেউ তা জানে না, কিন্তু বৃষ্টির রাতে ঠিক এখানে বেড়াতে আসেন। তাঁকে দেখলে মানুষ খুশি হয় না। দোতালার হলঘর তাঁর জন্যে খোলাই থাকে। এক বৃষ্টির রাতে ও-ঘরে একটি কাণ্ড হয়েছিল!"

"কি হয়েছিল?"

"রক্তাক্ত কাণ্ড! সন্ধ্যার সময় মালিক ফিরে এলেন—তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে তাঁর বন্দুক, পরনে তাঁর শিকারের পোশাক। তারপর—না, না, সে-সব কথা আপনাদের আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু সেইদিন থেকে এ বাড়ি খালি—এ বাড়ি কেউ ভাড়া নিতে চায় না!"

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, "তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছ যে, যা তা বলে ভয় দেখাতে চাও?"

"বেশ, তবে তোমরা থাকো, আমি চললুম। কিন্তু সাবধান, সাবধান, সাবধান!" বলতে বলতে বুড়ো লাঠি ঠকঠকিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদে আবার বাগানে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রকাশ বললে, "পাগল!"

আমি বললুম, "পাগল নয়, পাজি। বুড়োর হয়তো ইচ্ছা নয়, আর কেউ এ-বাড়ি ভাড়া নেয়। সে একলাই এখানে রাজত্ব করতে চায়। কিন্তু বাইরে যখন ভাড়াপত্র টাঙানো আছে, তখন আমাদের ভাবনা কি? চল, একবার দোতালার ঘরগুলো দেখে আসি।"

দোতালার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

আরো পুরু, আরো কালো হয়ে উঠেছে আকাশের মেঘ। আরো জোরে, আরো ঘন-ধারায় পড়ছে বৃষ্টি....ঝমঝম-ঝমঝম। সন্ধ্যার আগেই দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। দুই-কূল-ভাসানো নদীর-ছবি-আঁকা, জল-থই-থই-করা প্রান্তরের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছগুলো মাতাল হয়ে টলমল করছে ঝোড়ো-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে।

প্রকাশ বিষণ্ণ স্বরে বললে, "বুড়োর একটা কথা কিন্তু ঠিক। আজ এইখানেই বন্দী হতে হবে।"

"উপায় নেই।"

"কিন্তু খাবে কি?"

"আকাশের জল।"

"শোবে কোথায়?"

"পিছন ফিরে ঐ হলঘরটা দেখ। ওর তিনটে দরজাই খোলা। এখনো যেটুকু আলো আছে তাইতেই দেখা যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে রয়েছে বড় বড় সোফা, কৌচ আর চেয়ার। দেয়ালের গায়ে রয়েছে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত মস্ত ছবি আর আয়না। মেঝের উপরে কার্পেট পাতা। আশ্চর্য এই, এমন সাজানো বাড়ি খালি পড়ে আছে!"

প্রকাশ সন্দেহ-ভরা কণ্ঠে বললে, "তবে কি বুড়োর কথা মিথ্যা নয়? এখানা কি—"

"ভূতের বাড়ি? ক্ষেপেছ? তা মানলে বলতে হয় এ বাড়ির আসল ভূত হচ্ছে ঐ বুড়োই!"

"বিচিত্র কি! বুড়োর মতন চেহারা আমি কোনো মানুষেরই দেখিনি!"

আচম্বিতে কানে এল অপূর্ব এক সঙ্গীত! হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে যেন কোনো মেয়ে! রবীন্দ্রনাথের গান। গায়িকার গলা চমৎকার।

সবিস্ময়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে সেই গান শুনলুম।

আকাশে বেড়ে উঠল বিদ্যুতের জীবন্ত অগ্নিচিত্র ও উন্মত্ত বজ্রের চিৎকার! ঘরে-বাইরে কোথাও আর চোখ চলে না।

আমি বললুম, "এ গান আসছে কোথা থেকে?"

প্রকাশ বললে, "ঐ হলঘরের ভিতর থেকে।"

বিদেশে আসছি বলে সঙ্গে 'টর্চ' আনতে ভুলিনি। 'টর্চ'টা জ্বেলে দুজনেই হলঘরের ভিতরে ঢুকলুম। সব আসন খালি। ঘরের ভিতরে একটি 'অর্গ্যান' রয়েছে, তার সামনেও কেউ নেই।

প্রকাশ তবু জোর করেই বললে, "যে গাইছে সে এই ঘরেই আছে।"

আমি বললুম, "অসম্ভব। অন্য কোনো ঘরে কেউ গান গাইছে।"

প্রকাশ অস্বস্তি-ভরা স্বরে বললে, "না, না, গান হচ্ছে এইখানেই! যে গাইছে তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি! আমার মনে হচ্ছে, এ ঘরটা যেন হিমালয়ের বরফ-দিয়ে-গড়া! উঃ, কী ঠান্ডা! এ মানুষের ঘর নয় বন্ধু, এ হচ্ছে মড়ার ঘর!"

আমরা তাড়াতাড়ি আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রকাশের কথা মিথ্যা নয়। ঘরের চেয়ে বাহিরটা বেশ গরম—অথচ ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে সেখানে এসে পড়ছিল শীতল বৃষ্টিধারা!

অবাক হয়ে এর কারণ বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে কানে এল আর একটা নতুন শব্দ।

গট গট করে কার ভারী জুতোর আওয়াজ হচ্ছে।

প্রকাশ বিস্মিত স্বরে বললে, "সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে উঠছে। এ বুড়োর পায়ের শব্দ নয়!"

আমি বললুম, "বুড়ো মিছে কথা বলেছে। এ বাড়ি নিশ্চয়ই খালি নয়। কে গান গায়? কে উপরে ওঠে?" সিঁড়ির দিকে 'টর্চে'র আলো ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সিঁড়ির ধাপগুলো শব্দিত করে উপরের বারান্দায় এসে স্থির হয়ে রইল একজোড়া শিকারি-বুট—যা পরলে লোকের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না—মানুষ নেই অথচ একজোড়া শিকারি-বুট উপরে এসে উঠল, জ্যান্তো জীবের মতো!

মন বললে, ঐ দৃশ্যমান বুট পরে আছে কোনো অদৃশ্য দেহ এবং বারান্দায় হঠাৎ আজ দুই অনাহূত অতিথি দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সবিস্ময়ে!

প্রকাশ অস্ফুট স্বরে বললে, "শিকারি-বুট! বুড়োও বলেছিল, বৃষ্টির রাতে বাড়ির মালিক এসেছিল শিকারির পোশাক পরে!"

আমি উত্তর দেবার আগেই বুট-জুতোজোড়া যেন কোনো বেজায় ভারী দেহের চাপ নিয়ে আবার গট-গট শব্দে মাটি কাঁপিয়ে অগ্রসর হতে লাগল আমাদের দিকেই!

আমরা মহা আতঙ্কে পিছু হটতে লাগলুম পায়ে পায়ে। আমাদের দৃষ্টি স্তম্ভিত, হৃৎপিণ্ড করছে ধড়ফড়-ধড়ফড়।

হলঘরের তৃতীয় দরজার কাছে এসে বুট-জুতোজোড়া আবার থেমে পড়ল—ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তারপরেই সবেগে প্রবেশ করল ঘরের ভিতরে! গানের স্বর থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ ও তীব্র এক আর্তনাদ!

আমরা পাগলের মতো দৌড়ে এক এক লাফে সিঁড়ির তিন-চারটে করে ধাপ পেরিয়ে নীচে নেমেই দেখি, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত বুড়োর ভাঙা দুমড়ে-পড়া মূর্তি! সে একবার মুখ তুলে আমাদের পানে তাকালে—'টর্চের' আলোতে তার চক্ষু কোটরের খুব ভিতরে জ্বলে উঠল দুটো আগুনের কণা!

খিল-খিল করে হেসে বুড়ো খনখনে গলায় বলে উঠল, "মালিকের সঙ্গে দেখা হল? মালিকের সঙ্গে দেখা হল? মালিক কি বললে? বাড়ি ভাড়া নেবে নাকি? হি হি হি হি হি!"

দৌড়তে দৌড়তে বাগান পার হয়ে যখন বাইরে এসে পড়লাম, তখনও সেই ভয়াবহ বুড়োর অপার্থিব হাসির শব্দ থামেনি!

ভাদ্র ১৩৫৭

গোলদিঘির ভূত!

শিবরাম চক্রবর্তী

ভূতের কথা বলতে গেলে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। বছর কয়েক আগের কথা। তখন সবে এক দৈনিক পত্রিকার আপিসে সাংবাদিকের কাজে ঢুকেছি।

নামমাত্র কাজ। রবিবারের কাগজে একটুখানি লিখতে হয়—ফি হপ্তায়। আমার একটা আলাদা স্তম্ভ ছিল, তাইতেই লিখতাম।

লেখার কাজ এমন কিছু না, কিন্তু পড়ার কাজটাই ছিল ভারী! সপ্তাহে একবার ঐ একটুখানি লেখার জন্য এত বেশি আমাকে পড়তে হত—এত রকমের দৈনিক, সাপ্তাহিক আর সাময়িক পত্র ঘাঁটতে হত যে বলবার না। ভূত না হলেও, বলতে কি, সেই একটা বিভীষিকা ছিল।

এই রকম কাগজপত্র ঘাঁটবার কালে একদিন একটা খবর আমার চোখে পড়ল। দৈনিকটির প্রেরিত পত্রের স্তম্ভে একজনের একখানা চিঠি। চিঠিখানি স্তম্ভিত করবার মতোই!

পত্রদাতা লিখেছেন, "সম্পাদকমশাই, আমরা গোলদিঘি এলাকার বাসিন্দে। কিছুদিন থেকে ভূতের উপদ্রবে বড়ই উৎপীড়িত হচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে অশরীরী ভদ্রলোক তেমন কষ্টদায়ক না হলেও যখন-তখন যেখানে-সেখানে তাঁর অবাঞ্ছনীয় আবির্ভাব আর অন্তর্ধানে এ অঞ্চলের সকলেই আমরা বিশেষ কাহিল হয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা আমাদের প্লীহার পক্ষে খুব হিতকর নয়, এমন কি, হার্টের পক্ষেও। হার্ট যদিও পিলের মতন সহজে চমকাবার ছেলে না, কিন্তু তাহলেও, ছেলের মতো ফেল করতে পারে তো!—যাই হোক, আপনাদের বিশ্ববিশ্রুত পত্রিকার সংখ্যাহীন পাঠক-পাঠিকার কারো যদি এই ভৌতিক দুর্যোগের কোনো প্রতিকার জানা থাকে, যদি দয়া করে আপনার পত্রিকার মারফতে তিনি জানান তাহলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হবো। ইতি—ইত্যাদি।"

কলকাতার বুকের ওপর ভূত! একটু অভূতপূর্ব কাণ্ডই বই কি! এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে?

"কী ভাবচেন মশাই অমন গালে হাত দিয়ে?"

আরেকজনের কথায় আমার চমক ভাঙল। এই কার্যালয়েরই, আমার এক সহযোগী। আমার মতোই আরেকজনা।

"এই, ভূতত্ব।" আমি বললাম—"ভূতত্ব নিয়েই ভাবছিলাম।"

"ও, ভূতত্ব? আজকের ভূমিকম্পের কথা বলছেন? জাপানের সমুদ্রকিনারের তিনটি শহর ধসে গেছে, কত ঘর-বাড়ি গেছে, মরেছে যে কত হাজার—ইয়ত্তা নেই তার। বাস্তবিক, এই ভূমিকম্পগুলো কেন যে হয়, তার রহস্য আবিষ্কার করা—"

"আজ্ঞে, সে ভূতত্ব নয়, আমি ভাবছি ভূতত্ব"—বাধা দিয়ে বলতে গেলাম।

"একই কথা। ভূতত্ব আর ভূমিকম্পের তত্ত্ব এক। একই সূত্রে গাঁথা। একটার যদি আমরা কিনারা করতে পারি—"

"আহা, তা নয়। তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনে মশাই, আমি ভাবছি ভূত নিয়ে। ভূত আছে কি না, ভূতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব এই সব নিয়ে। যেমন মহৎ থেকে মহত্ত্ব, আমসৎ থেকে আমসত্ব, তেমনি ভূত থেকে ভূতত্ব। ভূমিকম্পের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।"

ব্যাকরণমতে আরো উদাহরণমালা যোগাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সম্পাদকের ঘর থেকে তলব এল।

যেতেই সেই কাগজটার ভূতপূর্ব অংশটা তিনি পড়তে দিলেন—"পড়ে দ্যাখো।"

"দেখেছি।"

সম্পাদক বল্লেন, "আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা আসেননি আজ, কেন কে জানে! তুমি একবার যাও দেখি। গোলদিঘির এই ভূতুড়ে ব্যাপারটার সবিশেষ জেনে এসো তো। খবরটা কালকের কাগজে সবিস্তারে ছাপাতে পারলে বেশ চাঞ্চল্যকর হবে। কাগজ কাটবে খুব।"

"আজ্ঞে, মাপ করবেন আমায়। ভূত আমি বিশ্বাস করিনে।" আমি জানালাম—"ভূতে আমার ভারী ভয়।"

"বিশ্বাস করো না তো ভয় কিসের আবার?" অবাক হলেন সম্পাদকমশাই।

"আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো। ওদের মোটেই বিশ্বাস নেই, ভূত ভারী ভয়ঙ্কর জীব।"

"আহা, তোমাকে কি ভূতের সঙ্গে মুলাকাত করতে বলেছি? অমূলক ভয় তোমার। আরে, তাদের কি পাত্তা মেলে? যাদের বাড়ি উপদ্রব হচ্ছে সেখানে যাবে, পত্রদাতার সঙ্গে দেখা করবে। করে বিস্তারিত সব জেনে, ফলাও করে লিখে আনবে—কাজ তো এই!"

"কিন্তু পত্রদাতার ঠিকানা তো কাগজে দেয়নি।" আমি দেখালাম—"চিঠিতে লেখা নেই।"

"আসল চিঠিতে আলবৎ ছিল, নইলে এ-চিঠি ছাপত না। কিন্তু সে-ঠিকানা তো ঐ কাগজের দপ্তর থেকে জানা চলে না। তাহলে যে ব্যাপারটা ওরা টের পেয়ে যাবে। আমরা যা করতে যাচ্ছি, মালুম পেয়ে নিজেরাই করে বসবে আগে। সব মাটি হবে তাহলে।"

"তাহলে?" আমার প্রতিধ্বনি হয়।

"একটুখানি জায়গা তো গোলদিঘি। অঞ্চলটায় ঘোরো গে। যাকে দেখবে একটু ভীত, ভাবিত, সন্ত্রস্ত—পাকড়াবে অমনি। মুষড়ে-পড়া কি ম্রিয়মাণ কেউ যদি তোমার নজরে পড়ে, ছেড়ো না তাকে। যদি কাউকে দ্যাখো খুব বিচলিত, বুঝবে সেই তোমার এই পত্রদাতা, কিংবা এই পত্রদাতার মতোই অপর কেউ, ভূতের উৎপাতে প্রপীড়িত। বুঝেচো? আলাপ করে ভাব জমিয়ে আসল কথা আদায় করবে তার কাছ থেকে। এমন কি শক্ত কাজ?"

তিনি তো আমায় চাঙ্গা করতে চাইলেন, কিন্তু আমার প্রাণ ঠান্ডা হয়ে এল। 'নিজস্ব সংবাদদাতার' পরস্মৈপদী বেগার ঠেলতে—বিশেষত, যার পেছনে এত ঠ্যালা—মোটেই আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া, ভূতের ব্যাপারে উৎসাহ—এক কথায় ভূৎসাহ—চিরকালই আমার কম। ভূতত্বে আগ্রহ কোনোদিনই আমার নেই। ভূতের ত্রিসীমানায় আমি বিরল। আনাচে-কানাচে ভূতের গন্ধ পেলেই আমার ভোঁ-দৌড়!

"আমি কি পারব?" তবুও আমি গাঁইগুঁই করি।

"পারবে হে, পারবে। তুমি তুখোড় ছেলে—তাই তো তোমাকেই এই গুরুভার চাপাচ্ছি....."

"আজ্ঞে, আমার দ্বারা কি এই দুঃসাধ্য কাজ—"

"হবে হে, হবে। অবশ্যি, চালাক তুমি তেমন নও, কিন্তু তা না হলেও, তোমার লাক্ আছে। তোমার ভাষাতেই বল্লাম কথাটা। তোমার ভাষা সহজে তুমি বুঝতে পারবে। সাদা বাংলায় কথাটা এই, এধারে-ওধারে একটু ঘুরে-ফিরে দেখবে, চোখ-কান খোলা রেখে। চাই কি, দৈবক্রমে একটু চেষ্টা না করতেই, হয়তো তোমার সঙ্গে লোকটার দেখা হয়ে যেতে পারে। এই নাও...."

এই বলে তিনি পকেট হাতড়াতে লাগলেন। তাঁর নিজের পকেট। হাতড়ে-টাতড়ে খুচরো-খাচরায় যা মিলল আমার হাতে সমর্পণ করলেন—

"এই নাও টাকা দু-আড়াই হবে। কাজটা সারার পর কফি-হাউসে গিয়ে—গোলদিঘির কাছেই তো কফি-হাউস! কফি-টফি যা হয় খেয়ো প্রাণ ভরে।"